ফুটবলানন্দ
আমরা বন্ধু'র ফুটবল স্মৃতি সংকলন

ফুটবলানন্দ

আমরা বন্ধু ব্লগের বন্ধুদের ফুটবল স্মৃতি সংকলন

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ

১৩ জুন ২০১০

প্রকাশক

www.amrabondhu.com

প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ ও সমন্বয়

নজরুল ইসলাম

মুখবন্ধ

আমাদের সবচেয়ে প্রাণের খেলা ফুটবল। ফুটবল খেলা নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের কোনো কমতি নেই। নিজেদের বালক বেলা কেটেছে ফুটবল নিয়ে, বড়বেলাতেও দেখার বেলায় আমরা ফুটবলকেই প্রাধান্য দেই। একসময় আবাহনী মোহামেডান নিয়ে পুরো জাতি যে পরিমান মেতে থাকতো, তা হয়তো এখন নেই। কিন্তু তবু ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম তা বলা সম্ভব না। বিশ্বকাপ এলেই গোটা দেশ ছেয়ে যায় ব্রাজিল আর্জেন্টিনার পতাকা দিয়ে। এ কেবল ফুটবলের প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ।

চার বছর পরে আবার এলো বিশ্বকাপ ফুটবল। আমাদের ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নেই। কিন্তু উন্মাদনার কোনো কমতি নেই। ফেসবুক স্ট্যাটাস ভর্তি ফুটবল সংবাদ। পত্রিকাগুলোও করছে বিশেষ আয়োজন।

আমরা বন্ধু কেন পিছিয়ে থাকবে?

না, পিছিয়ে থাকেনি। ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে আমরা বন্ধু প্রকাশ করছে ই-পুস্তক। যেখানে বন্ধুদের ফুটবল বিষয়ক স্মৃতিচারণ ঠাঁই পাবে। পেয়েছে।

এই ই-পুস্তকটি তাই সমগ্র ফুটবল প্রেমীর জন্য।

যারা লেখা দিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। যারা পড়ছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই কাজে অনেকেই নানারকম সহযোগিতা করেছেন। আলাদা করে নাম না বলে, তাদের সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখাগুলো সাজানো হয়েছে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে

সবাইকে ধন্যবাদ

নজরুল ইসলাম

সমন্বয়কারী

সূচীপত্র

লেখক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
রাফি	ফুটবল ফুটবল	৫
তানবীরা	ফুটবল ফুটবল	৭
রায়হান সাঈদ	খুশীর বিড়ম্বনা	১২
অদ্রোহ	চর্মগোলকের সাথে বসবাস	১৪
নজরুল ইসলাম	সেই রাতের কথা বলতে এসেছি	১৭
মামুন হক	বুচার অভ বেঙ্গল	১৯
মুক্ত বয়ান	ফুটবলকাহন	২২

ফুটবল ফুটবল

রাফি

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কেন কাবাডি, সেইটা নিয়া প্রশ্ন না করাই ভালো, তবে সবচে জনপ্রিয় খেলা যে ফুটবল, সেইটা বিনা তর্কে মাইনা নেয়াই উচিত।

ক্রিকেটে আমরা বিশ্বকাপে খেলি, কয় দেশরে নিয়া জানি ক্রিকেট বিশ্বকাপ হয়? তারপর দেখতে বসলে বিরক্তি আসে, মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হয়্যা যাই। তবে ক্রিকেট দেখার সময় ব্লগিং করা বা পাশে নরম হাতের কোন ললনা থাকলে তার হাতটা হাতে নিয়া খোশগল্প করার ব্যাপক অবকাশ পাওয়া যায় এইটা নিয়া কুনো সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশ কেনিয়ারে হারায়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ান হয়া বিশ্বকাপে গেলে আমি বা আমার বন্ধুরা ব্যাপক খুশি হয়া বলছিলাম, আমাদের যা ভরসা ক্রিকেটেই। ফুটবলে আসলে মজা নাই। কিন্তু ৯৮ এর বিশ্বকাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে রাত জাইগা খেলা দেখা, খেলার আগে বিরোধী পক্ষরে চেতানো, বা হলের টিভিরুমের একপাশের দেয়ালে প্রিয় টিমের পতাকা আর প্লেয়ারদের ছবি টাংগায়া যে আনন্দটা করলাম, তার বিন্দুমাত্র ক্রিকেট বিশ্বকাপে না পায়া বুঝলাম, ফুটবলের উপর খেলা নাই। নব্বই মিনিটের বিরামহীন দৌড়াদৌড়িতে অল্টাইম চোখ থাকে টিভি পর্দার সাথে লাগানো। ফিলিংসই আলাদা।

> এই খেলাটা সার্বজনীন, যেখানে যাবেন এইটারে পাবেন, বা নিজেও খেলতে পারবেন। পাশাপাশি দুইটা টিভির এক্টাতে ক্রিকেট আর আর এক্টাতে ফুটবল চালায়া দেখেন, চোখ কোন দিকে যায়

এই ফুটবল খেলতে গিয়া উপরে পাটির সামনের দুইটা দাত নড়বড়া হইলো ক্লাশ সিক্সে, পরে সেই দুইটা নিজের মত কইরা অন্যদের তুলনায় বড় হয়া গেলো। এই ফুটবলের জন্য হাত কয়েকবার মচকায়া শেষে কলেজে আইসা ভাংগাই ফেললাম। পায়ে অসংখ্য জায়গায় চোটের নিশান আছে, পায়ের ভেতরের কলকব্জাও নানা আঘাতের চিহ্ন বহন করতেছে যা মাঝে মাঝে জানান দেয়। আর এই বুড়া বয়সে ফুটবল খেলতে গিয়া এমন ভাবে সেদিন ব্যাথা পাইলাম যে এখনো হাটতে ব্যাথা লাগে, বাধ্য হয়া ফুটবল বাদ দিয়া টেনিসে গেছি।

ফুটবল খেলার জন্য স্কুলে আগে গেছি, খেইলা প্রথম ক্লাশে গেছি, আবার টিফিন পিরিয়ডে খেলতাম আর ঘেমে নেয়ে ক্লাশে ফিরতাম। স্যাররা তখন জিগাইতো, কিরে মাটি কাইটা আসছোস নাকি? ক্লাশ শেষে পারলে আবার। তারপর দেরীতে ফেরার জন্য

আম্মার হাতের চুলটানা খাইতাম। এই ফুটবলে মোহামেডানরে সাপোর্ট করার ফলে বাসায় দীর্ঘদিন সংখ্যা লঘু ছিলাম, পরে মোহামেডানের উপুর্যপুরী সাফল্যে উদ্বেলিত হয়া আমার মেজ ভাই পালটি মাইরা মোহামেডানের পতাকা তলে আসায় আমার অবস্থা চেঞ্জ হয়। মোহামেডানের সাপোর্টার বইলা বন্ধুগো মধ্যে যারা আবালগনীর সাপোর্টার, তাগো নানা ছড়া বানায়া খেপায়তাম, মোহামেডান হারলে ওগো সাথে বাত বিরতী দিতাম। আহারে সেই সোনার দিন গুলি.....।ডানা-গোথিয়া কাপ জেতার পর তো ধরছিলাম বাংলাদেশ বিশ্বকাপে গেলো বইলা। হইলো না আর.....।

এই খেলাটা সার্বজনীন, যেখানে যাবেন এইটারে পাবেন, বা নিজেও খেলতে পারবেন। পাশাপাশি দুইটা টিভির এক্টাতে ক্রিকেট আর আর এক্টাতে ফুটবল চালায়া দেখেন, চোখ কোন দিকে যায়...।।তবে খেলাটার ইজ্জত মনে হয় একটু কম। জীবনের প্রথম চাকরীর সফল ইন্টারভ্যু দিয়া ক্যাম্পাসে ফুটবল খেলায় আমার এক সিনিয়র সহকর্মী আমার উপর নাখোশ হইছিলেন। কামটা নাকি ঠিক হয় নাই।

এইবারও বিশ্বকাপ ফুটবল দেখুম, রাত জাইগা কষ্ট কইরা হইলেও। একলাই দেখতে হইবো এইটাই কষ্টের।

ফুটবল ফুটবল

তানবীরা

লুকে বলে, যে যায় বঙ্গে তার কপাল যায় সঙ্গে। আমি সেদিক থেকে যাকে বলে এ প্রবচনকে সার্থক প্রমান করে ছেড়েছি। যেমন ধরেন, কয়দিন আগে পেপারে দেখলাম, জলবায়ুর পরিবর্তনের হার যদি এই থাকে তাহলে প্রথমে বাংলাদেশ, হল্যান্ড আর ফ্লোরিডা ডুবে যাবে। মনটা খারাপ হলো, এতো কষ্ট করে বিদেশে থেকেও যদি ডুবে যেতে হয়। আমি খুবই মন খারাপ করে এই খবরটা আমার বরকে বলতেই সে বললো, তুমি কান্দো কেনো? তুমি কি ফ্লোরিডা যাওয়ার কথা ভেবেছিলে নাকি? আমি অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, ভয় পেও না, ডুবার আগে আমরা পাহাড়ী কোন দেশে চলে যাবো। ফুটবল নিয়ে কাহিনীও প্রায় সে পর্যায়ের। নজু ভাইয়ের আহবানে তাই সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

দেশে আধা পরিচিত কারো সাথে দেখা হলে ছোটবেলার কিংবা ছুটে যাওয়া পরিচয় আবার রিফ্রেশ = তাজা করতে হয়। যেমন এখন কোথায় থাকো, কতো বছর আছো, কেমন লাগে, দেশে ফেরার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ইত্যাদি প্রভৃতি । এদের মধ্যে যারা আবার একটু নতুন জেনারেশন কিংবা যারা ভাব দেখায় যে বাংলাদেশে পরে থাকলেও দেশ - বিদেশের শিল্প - সংস্কৃতির অনেক খবরই তাদের জানা। তারা আবার একটু ডিটেলে জিজ্ঞেস করেন। কোন শহরে থাকি, এন্ডহোভেন শুনলে তাদের মধ্যে আবার যারা অতি বিশেষজ্ঞ তারা পেই - এস - ফেই 'র খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন। কিংবা এ্যাজ়াক্স বা পি - এস - ভি 'র মধ্যে কোনটাকে সাপোর্ট করি। খেলা দেখতে যাই কিনা ইত্যাদি । এ্যাজ়াক্স বা পি - এস - ভি ' দুটো শব্দই কানে লাগে। ডাচদের এ্যালফাবেট পুরোই আলাদা। তাদের কাছে কোন "জ" আর "ভ" নেই। সুতরাং তাদের উচ্চারনে এটা হলো "এ্যায়াক্স" আর "পেই - এস - ফেই"। লিখে অবশ্য এই বানানে কিন্তু উচ্চারন আলাদা আর কান আজকাল এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে । আমাদের দেশের আবাহানী - মোহামেডান ব্যাপার হলো এই এ্যায়াক্স আর পেই - এস - ফেই । এ্যায়াক্স হলো এ্যামষ্টারডাম আর পেই - এস - ফেই হলো ফিলিপ্স এর তৈরী এন্ডহোভেন এর দল। খেলা - ধূলায় আমার দক্ষতা হলো এক্কা - দোক্কা, লুডু, ক্যারাম। পুতুল খেলাকে যদি খেলাধূলা ক্যাটাগরীতে ধরা হয় তাহলে ছোটবেলায় সিগারেটের খালি বাক্স জমিয়ে তার মধ্যে পুতুলের ঘর সংসার। এসব চিরাচরিত অহিংস খেলার কেনো যে কোন প্রতিযোগিতা হয় না কে জানে ? অথচ বাংলার ঘরে ঘরে অসংখ্য কোমলমতি বাচ্চা এগুলো আজো খেলছে। এর বাইরে অবশ্য আর একটা খেলা ছিল। সেটা শীতের দিনে বড়ো ভাই - বোনেরা আমাদের ছোটদের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে আমাদের স্বপ্নের নায়ক - নায়িকা হয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে, তাদের রেকেট যখন ফেলে দিয়ে যেতো সেই রেকেট নিয়ে সাথে ছাল উঠা কর্ক দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা। কিংবা সেই কোটে প্রানপাত ঝাপাঝাপি করা। শীতের দিনে বড়রা বাইরে লাইট জ্বালিয়ে উঠোনের মধ্যে নেট টানিয়ে পাড়ার সব

এক বয়সীরা এক হয়ে বিরাট হৈ চৈ করে ব্যাডমিন্টন খেলার সেই কালচার আজ আর ঢাকার কোথাও আছে কিনা কে জানে ? ফ্ল্যাট কালচারেতো সবাই ফার্মের মুরগীর মতো হয়ে থাকে | আমাদের সময় সেগুলো ছিল অতি সাধারন ব্যাপার| যখন অন্য বাড়িতেও খেলা হতো, নিজেদের বাড়ির দাওয়া থেকে রেকেটের চাপের আওয়াজ কিংবা শট শট শাটলের আওয়াজ পেতাম, হৈ চৈ এর কথাতো বাদই দিলাম| দু চোখ জুড়ে স্বপ্ন থাকতো কবে ওতোটা বড় হবো, বড় বোনদের মতো কোমড়ে ওড়না পেচিয়ে, কেডস প রে ভাইদের সাথে পাল্লা দিয়ে হৈ হৈ খেলবো? খেলতে খেলতে এই শীতের সন্ধ্যায়ও ঘেমে নেয়ে যাবো, পয়েন্ট নিয়ে আকাশ - পাতাল এক করা ঝগড়া করবো? সেই ঝগড়া পড়ে বহু দিকে মোড় নিবে, কতো দিন কথা বন্ধ থাকবে, ভাইদের শার্ট ইস্ত্রী করে দেয়া বন্ধ , প্রতিশোধ স্বরূপ বোনদের গল্পের বই এনে দেয়া বন্ধ বাইরে থেকে ইত্যাদি| যদিও ভাইরা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে বোনদের থেকে নমনীয় ছিল|

এই বড় ভাইবোনদের বদৌলতেই আর একটু জ্ঞান ছিল আবাহানী - মোহামেডান নিয়ে | জানতাম এরা বিরাট কিছু| এরা বীরদর্পে মাঠে খেলবে, সেই নিয়ে বাসায় টিভিতে খেলা দেখতে দেখতে প্রচন্ড লাগালাগি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভাঙ্গাভাঙ্গিও হয়ে যাবে | সব ভাঙ্গাভাঙ্গি যে সজ্ঞানে হবে তা না| হয়ত খেলা দেখতে দেখতে চা খাওয়া হয়েছিল, কাপটা তখনো তোলা হয়নি, আছে কাছে - পিঠে , ওদিকে বল নিয়ে ইউসূফ দৌড়া চ্ছে এদিকে উত্তেজনায় ছোট চাচা কিংবা মেজ ভাইয়া চিৎকার করছে ‘গোল - গো ও ও ও ল’ সাথে তাদের পাও প্রাকৃতিকভাবে ক্রিয়া করছে, ফলশ্রুতিতে কাপ শেষ , বড়চাচী কিংবা মেজচাচীর চিৎকারে রস ভং | আমরা সেই পাঁচ / ছয় বছর বয়সে টিভির খেলা আর কি বুঝবো আর কি দেখবো , বাসার খেলা তার চেয়ে ঢের ঢের আকর্ষনীয় এবং সুন্দর| আহা কি যে মধুময় সেই সময় ছিল| জনম জনম ধরে সেই সময়কে ফিরে পেতে চাইবো | যদিও আমি ফুটবল, আবাহানী - মোহামেডান কিছুই বুঝতাম না কিন্তু ক্লাশ থ্রিতে পড়ার সময় আমি পাক্কা আবাহানীর সাপোর্টার হয়ে গেলাম, আমার কলেজে পড়া মেজ বোন মনি আপার কারনে| সেই যে সাপোর্টার হলাম তা আর বদলানো গেলো না, নৈতিকতার কারনে | শুধুতো ফুটবল না তার সাথে অনেক জাগতিক বিষয় জড়িত , লয়ালিটির ব্যাপারও আছে| সেই বয়সে কলেজে পড়া বোনদের প্রভাব এড়ানোর কথা ভাবাই যায় না | বোনেরা তখন সেই দিনের হার্ট থ্রব রেখার মতো চুলে দুই বিনুনী ঝুলিয়ে কলেজে যায়, চোখে কাজল দেয়, রেখার সাথে বিনোদ মেহরার ঘর ভাঙ্গা নিয়ে খুবই আলোচনা হয় বাসায়| আমার চোখে ঘোর| মনি আপা যেদিকে ঘুরে আমি ঘড়ির

হয়ত খেলা দেখতে দেখতে চা খাওয়া হয়েছিল, কাপটা তখনো তোলা হয়নি, আছে কাছে - পিঠে, ওদিকে বল নিয়ে ইউসূফ দৌড়াচ্ছে এদিকে উত্তেজনায় ছোট চাচা কিংবা মেজ ভাইয়া চিৎকার করছে ‘গোল - গো ও ও ও ল’ সাথে তাদের পাও প্রাকৃতিকভাবে ক্রিয়া করছে, ফলশ্রুতিতে কাপ শেষ, বড়চাচী কিংবা মেজচাচীর চিৎকারে রস ভং

কাটার মতো সেদিকে ঘুরি। বাসায় পিঠাপিঠি বড় বোনদের মধ্যে ঝগড়া হয় নানাবিধ বান্ধবী সংক্রান্ত, গল্পের বই, সাজগোজ এর ব্যাপার নিয়ে। আমরা ছোটরা যে যার আইডিয়ালের দলে ভীড়ে যাই এবং নিজেরাও ঝগড়া করি। কি নিয়ে ঝগড়া করি বুঝি না, সুন্দর লাগে ওরা করে তাই আমরাও করি। আজ কোন বোন এ্যামেরিকা, কেউ কানাডায়, কেউ সুদূর কুয়েতে, কিন্তু সেদিন আজো সবার বুকে তোলপাড় করে। এক আধ সময় ছুটিতে কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে কতো কথা মনে পড়ে। আমাদের অনেক সাঙ্কেতিক মজা আছে যা আর কেউ জানবে না, বুঝবে না। সেই নিয়ে আমরা যখন হেসে গড়িয়ে পড়ি তখন বড় বোনের মেয়েরা কিংবা আমার ছোটবোনেরা মুখ কালো করে বলে, কি নিয়ে এতো হাসো আমাদেরকে বলো না। কিন্তু এগুলো কি শুধু বাংলায় বললেই কেউ বুঝতে পারবে? তাকে যেতে হবে সে সময়ে ফিরে। শুধু কথা কি সময়কে ধারন বা উপস্থাপন করতে পারে?

যাক ধান বানতে শীবের গীত অনেক হলো। যে কথা লিখতে বসেছিলাম "ফুটবল"। তো যার জ্ঞান হলো বল নেটে ঢোকা মানে হলো গোল তার কাছে কেউ যখন নেদারল্যান্ডস তথা এন্ডহোভেন এর ফুটবল নিয়ে প্রশ্ন করে, তার চোখে ফুটবল কেমন হতে পারে? তেমন কোন ফুটবলজ্ঞানহীন ব্যাক্তির দৃষ্টিতে আজকের ফুটবল বৃত্তান্ত। কিংবা বাংলাদেশ তথা ইউরোপ বা নেদারল্যান্ডসের ফুটবল সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা বলাই ভালো। ফুটবল খেলার অতি প্রয়োজনীয় একটা অংশ হলো ঠোলা বাহিনী। বাংলাদেশের ঠোলা বাহিনীকে কারনে অকারনে জনগনের সাথে অনেক কুস্তী করতে হয়। গারমেন্টস সমস্যা পিটাও শালা, ইউনিভারসিটি - ছাত্র সমস্যা দাও পিটা, বন্যারত চাল চেয়েছে দাও খুলী ফুটিয়ে, ফরদা ফাই করা ছাড়া জনগনরে এরা আর কিছুই করে না। এরা সমস্ত ইস্যুতে মারামারি করে সারাক্ষন এতো টায়ার্ড থাকে যে খেলার মাঠে আয়েশী ভঙ্গীতে হাটাচলা করে, টিভিতে খেলা দেখার সময় দেখলে অন্তত তাই মনে হয়, এরা মাঠের মধ্যে এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে থাকে খুব একটা নড়ে চড়ে না। এদের তখন বিশ্রাম নেয়ার সময়। হয়তো বড় স্যারের প্রিয় ঠোলারাই এই মহান আনন্দময় দ্বায়িত্ব পায়, খেলাধূলার ডিউটি দেয়ার। এরা মনের আনন্দে সহ পুলিশদের সাথে বুক ফুলিয়ে ঝালমুড়ি আদান - প্রদান করে খায় আর বাড়ির বউ - ঝিদের খবর বা কুশলাদি বিনিময় করে কাটায় খেলার সময়। এবার ইউরোপের পোতানো পুলিশদের দেখা যাক। এরা সাধারনতঃ কেউ এ্যাক্সিডেন্ট করলে, গুরুতর আহত হলে তাকে হাসপাতালে পৌছানো, না গুরুতর হলে কার দোষ সেটার রিপো র্ট লিখে ছেড়ে দেয়া , ভুল পার্কিং এর ফাইন লেখা , দোকানে কেউ চুরি করলে তার ফাইন লেখা ছাড়া আর ঝিমানো ছাড়া জনগনের তেমন কোন ধর ধর, মার মার টাইপ রক্ত গরম করা সেবার সুযোগ পায় না। থাকতি আমাদের দেশে তাহলে জানতি জনসেবা কাহাকে বলে ? সেই তারা যখন ফুটবল খেলার ইস্যু পায় তখন তাদের কে রুখবে ? বিরাট রয়েল বেংগল টাইগার সাইজের কুত্তা পাশে ঝুলিয়ে বীর বিক্রমে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে ট্রেনিং এর সময়ের শেখা সমস্ত কায়দা রিভাইস দিতে লেগে পড়ে । আমার অফিস ঠিক ফিলিপস ষ্টেডিয়ামের পিছনে। অফিসের দিন মানে বিরাট জ্যাম, আর ছুটির দিন হলেতো রক্ষা নাই। আশে পাশে কয়েক ডজন ভাসমান বিয়ারের দোকান দিয়ে বসবে মানে বেশ কটা রাস্তাও বন্ধ থাকবে। যাবেতো যাও দেখি একখানা ভাবের খেলা হবে। সমস্ত রাস্তা গুলো বন্ধ করে দিয়ে ওয়াকিটকি নিয়ে হাঁটবে আর কথা বলবে। এমন এক পরিস্থিতি তৈরী করবে ফুটবলতো যেনো নয়, প্রেসিডেন্ট ওবামা প্লেন থেকে এখন অবতরণ করবেন। আর আমরা যেনো বোমা নিয়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। পুলিশ দেখলেই আমার ভয় লাগে। হোক দেশী পুলিশ কিংবা বিদেশী। হয়তো মনের মাঝে এদেরকে পারমানেন্ট

অপছন্দ করার একটা চোর চোর ভাব আছে বলেই মন পুলিশ পুলিশ ডরায় । গাড়ী থামিয়ে যখন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকায়, তখন শিশুকালে কবে মায়ের কাছে স্কুল ফিরে মিথ্যে কথা বলেছিলাম ভয়ে সেটাও মনে পড়ে যায়।

আর সাথের কুকুরের কুত্তাভেদী দৃষ্টির কথা না হয় বাদই দিলাম। আমাদের দেশের কুকুরের মতো থোড়াই নিরীহ ভদ্র চেহারার, গোবেচেরা কুকুরতো এগুলো নয়। যে লেজ নেড়ে নেড়ে রাস্তার আর একপাশ দিয়ে হেঁটে যাবে মানুষের ভীড় ভাট্টা এড়িয়ে চলবে। গাট্টা - সাট্টা সাইজের ভোম্মা পালোয়ান চেহারা আর ব্যবহার । দেখলেই আত্মারাম খাচা ছাড়া টাইপ। অবশ্য এদেশের কুকুরদের স্ট্যান্ডা র্ড ওফ লিভিং এর সাথে আমাদের দেশের দরিদ্র কেরানী টাইপ কুকুরদের স্ট্যান্ডা র্ড অফ লিভিংই এই চেহারা আর স্বভাবের জন্য দায়ী। যাহোক অনেক মানুষের থাকে কুকুর ভীতি আর আমার যেটা আছে সেটা হলো 'ফোবিয়া'। দু একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই ধারনা করা যাবে। একবার আমি আর আমার বর পার্কে হাটছি আর গল্প করছি । কোন এক পর্যায়ে আমি খুব রেগে গেছি আর ওর পাশ থেকে বেশ একটু দূরে হাঁটছি। ও অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে সামনে হাঁটছে। হঠাৎ কোন একটা শব্দ শুনে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। দেখি আমার পাশেই রয়েল বেংগল টাইগার সাইজের কেউ তার প্রাকৃতিক কর্ম সারতে বের হয়েছে। আমি দিগবিদিক জ্ঞান শূন্যে হয়ে দৌড়ে স্বামীকে যেয়ে ধরতেই তিনি অবাক হয়ে পেছনে তাকানো মাত্রই ঘটনা কি বুঝতে পারলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন, না হবে না, বিপদে পড়লেই আমাকে ইউজ করবে সেটা চলবে না। আর একবার রাস্তায় আমরা দুই খুব প্রিয় বান্ধবী হাঁটছি আর গল্প করছি খুবই মগ্ন হয়ে , আশেপাশে কোথায় কি হচ্ছে , সে খেয়াল বাদ দিয়ে । চোখ ছিল মাটির দিকে । হঠাৎ একটা কেমন যেনো শব্দ পেয়ে মাথা তুলে দেখি আমার সামনে একটা হাতী সাইজের কুকুর এক বিঘৎ জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি না আমার কি হোল, এক সেকেন্ডের মধ্যে আমার বান্ধবীকে আমার পাশ থেকে টেনে এনে কুকুরের মুখের কাছে ঠেলে দিলাম । আমার মাথা করেছে এটা , না আমার হাত করেছে আমি জানি না এখনও। যদিও ইউরোপীয়ান সভ্য কুকুর । ভদ্রতা জানে, আমাদেরকে শুঁকেই চলে গেছে , কিন্তু আজ প্রায় দশ বছর ধরে আমার বান্ধবীর খোঁটা আমি খেয়ে যাচ্ছি। বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধুর নামে আমি যে কলঙ্ক সেটা আমি নিজ হাতেই প্রমান করে দিয়েছি । তো সেই কুত্তা যখন আমার গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এক হাত লম্বা জিভ বের করে, পুলিশের মতো উনিও রুম থেকে বের হতে পাওয়ার বিমল আনন্দে উৎসাহে হ্যা - হ্যা - করে শব্দ করে, মাঝে মাঝে আবার দুই পা আমার গাড়ীর

> সবাই দিনের খেলা শেষ করে যার যার গন্তব্যে চলে গেছে, আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ বিদেশী কেউ বুকের মধ্যে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে করিডোরের এ মাথা ও মাথা হাঁটছে আর সান্ত্বনা দিচ্ছে, আমার মেয়ে তার গলা নিশ্চিত নির্ভরতায় দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখে মায়ের জন্য হাপুস নয়নে কেঁদে গঙ্গা - যমনা এক করছে

জানালায় দিয়ে আমার সাথে চোখাচোখি করার চেষ্টা করে, কিংবা গাড়ীর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। আমি তখন শুধু ভাবি নাইট রাইডারের গাড়ির মতো ওপর থেকে কিছু খুলে যেতো আর আমি যদি উড়াল পংখী হইয়া উড়ে যেতে পারতাম। শীতের মধ্যেও ভয়ে আমার অন্তর আত্মা শুকিয়ে কাষ্ঠ প্রস্তরবত মূর্তি সমবেত হয়ে যায়। গাড়ির জানালার আড়াল আমার আর কুকুরের মধ্যে যথেষ্ঠ লাগে না, সারাক্ষণ মনে হয় জানালা ভেদ করে দিল দাঁত বসিয়ে । এ সমস্ত যন্ত্রনা সহ্য করে জ্যাম ঠেলতে ঠেলতে অফিসে ঢুকি। কখনও আধ ঘন্টা লেটতো কখনো তার বেশী যা আমাকে কখনো না কখনো অফিসে থেকে পুষিয়ে দিতেই হবে। কোথায় কে বল লাথথি দিবে কি না দিবে সে জন্য আমার জীবনের আধ ঘন্টার ফাউ অপব্যবহার।

আর যদি খেলা ইন্টারন্যাশনাল না হয়ে, ন্যাশনাল হয় তাহলে সকালের বদলে এই চেক আপ পর্ব শুরু হবে দুপুরের পর থেকে, সুতরাং যাওয়ার পথ না আসার পথের পাঁচালী এখন। সেইই জ্যামে গাড়ি ঢুকিয়ে বসে থাকো। এদিক সেদিক রাস্তা বন্ধ করে এ্যারো দিয়ে রেখেছে কিন্তু এ্যারো মিস করলেও কোন অসুবিধা নেই। সামনের গাড়ী আর পিছনের গাড়ীই আপনাকে বের হবার আপন জায়গায় নিয়ে ফেলবে । আমি গাড়ীতে বসে বসে শুধু ভাবি আজকে আমার বাসার সমস্ত রুটিন লেট হলো। মেয়েকে খাওয়ানো লেট, গোসল দেয়া, পড়ানো সবই লেট। এসব ভাবতে ভাবতেই ঝটিতে মনে পড়ে জেডা'র মা এসে কি জেডাকে নিয়ে গেছে ক্র্যাশ থেকে তাহলেতো আমার মেয়ে ভ্যা ভ্যা কেদে সারা ক্র্যাশ মাথায় করবে আর আজ সারা সন্ধ্যা যাবে কাঁদতে কাঁদতে "মা তুমি কেনো আমাকে নিতে আসছিলে না? কেনো এতো দেরী করছিলে?" এই সংলাপের ওপর দিয়ে । বেশী কান্নাকাটি করলে অবশ্য ক্র্যাশ থেকেই ফোন দেবে আমাকে , বলবে, তুমি তোমার মেয়েকে একটু নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাওতো যে তুমি ওকে শিগগীরই নিতে আসছো। ওর বাবাকে ফোন দিয়ে লাভ নেই , উনি আসতে আসতে আরো সন্ধ্যা। যখন শেষ বেলা ক্র্যাশে যেয়ে পৌছবো, মোটামুটি সব আলো নেভানো , সবাই দিনের খেলা শেষ করে যার যার গন্তব্যে চলে গেছে, আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ বিদেশী কেউ বুকের মধ্যে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে করিডোরের এ মাথা ও মাথা হাঁটছে আর সান্ত্বনা দিচ্ছে, আমার মেয়ে তার গলা নিশ্চিত নির্ভরতায় দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখে মায়ের জন্য হাপুস নয়নে কেঁদে গঙ্গা - যমুনা এক করছে । এ দৃশ্যটা দেখলেই বুকের মধ্যে কি একটা অনুভূতি হয় সেটা কাউকে ব্যাখা করে বোঝানো যাবে না । এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয় সে ধরনের কারো কাছে কেউ যখন জিজ্ঞেস এন্ডহোভেন এর ফুটবল কিংবা পি। এস। ভি এর কি অবস্থা, পেপারে দেখলাম ব্লা ব্লা ব্লা .....।

এর উত্তর কি হতে পারে? সবই কি আমার দোষ?

খুশীর বিড়ম্বনা.....

রায়হান সাঈদ

এক সময় আবাহনী-মোহামেডান ফাইনাল মানেই ছিল ছিল টান টান উত্তেজনা । বিটিভি সরাসরি দেখাতো খেলা তারপরেও সেটডিয়াম থাকতো কানায় কানায় পূর্ণ । আর টিভিতে খেলা দেখার জন্য সকাল থেকেই চলতো প্রস্তুতি , স্নায়ু চাপ কাজ করতো ভিতরে ভিতরে । আগে ভাগে খেয়ে দেয়েই টিভির রুমে বসে নিজের জায়গা নিয়ে বসে অপেক্ষা করতাম খেলার জন্য। তখন টিভি জিনিসটা এত এভেইলএবল ছিল না বলেই আশ পাশ থেকে সবাই আসতো টিভিতে খেলা দেখার জন্য। মামা ও তাঁর বন্ধুরা , চাচা ও তাঁর বন্ধুরা, আমার এলাকার বন্ধুরা , অন্যান্য আত্মীয় স্বজন - টিভির রুম থাকতো কানায় কানায় পূর্ণ, ঘরের ভিতরই মিনি স্টেডিয়াম । আমরা জুনিয়র গ্রুপ নিচে ফ্লোরে বসতাম, আর সিনিয়র গ্রুপ উপরে সোফা কিংবা ডিভানে।

> ছোট খালা আসতে না আসতেই আবাহনীর গোল !!! চিৎকার, উল্লাস ঘরের ভিতর। আমার ছোট খালাও ছিলেন আবাহনীর সাপোর্টার , তিনিও সেই খুশীতে সামনে বসা সেই বয়স্ক লোক কে জড়িয়ে যেই ধরলেন, ধরেই দেখেন যে তার হাতে দাড়ি জাতীয় কি যেন লাগছে। আর বেচারা মুরুব্বি মানুষ আচমকা এরকম জড়িয়ে ধরে দেখে হতভম্ব হয়ে চুপ করেই ছিলেন

টিভির ঘরের সাথেই লাগানো ছিল ডাইনিং রুম। দুই ঘরের মাঝে পর্দা দিয়ে আলাদা করা। সেই পর্দা হালকা ফাঁকা করে বাসার মহিলার বসে খেলা দেখতেন । এক আবাহনী - মোহামেডান ফাইনালের দিন। খেলা সম্ভবত শুরু হতো ৪ টা কিংবা ৪.৩০ এ। খেলা চলছে , ঘরের ভিতর দুই দলের সাপোর্টারদের ভিতএর তুমুল উত্তেজনা, তুবড়ি চলছে কার দল শ্রেষ্ঠ - সেই নিয়ে, আমরা ছোটরা নিচে বসে খেলা দেখছি আর বড়দের কথায় নিরবে সমর্থন দিচ্ছি । আর পর্দার ওপারে আমার মেজ খালা চেয়ারে বসে

খেলা দেখছিলেন, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন ছোট খালা ।

খেলার মাঝেই অবধারিত ভাবে আসর এর আযান । আযান দিল, খালারা উঠে চলে গেলেন নামাজ পড়তে। আযানের পর আবার খেলা দেখানো শুরু। আর এর মাঝেই পর্দার আড়ালে থাকা মেজো খালার বসে থাকা সেই চেয়ারে এসে বসলেন আমার মামার এক বন্ধুর বাবা । বয়স্ক দাড়িওয়ালা মানুষ। পাঁচ অয়াক্ত নামাজ পড়েন , আলখাল্লা পড়েন, মাথায় টুপির উপরে স্কার্ফ থাকে সবসময়। তিনি খেলা দেখছিলেন আপন মনেই। আর নামাজের পর কোন কারনে মেজো খালা আর আসেননি খেলা দেখতে, ছোট খালা নামাজ পড়ে একটু গপ-সপ করে আসলেন আবার সেখানেই। মামার বন্ধুর বাবা মাথায় কাপড় দেয়াতে পিছন থেকে ছোট খালা বুঝতে পারেন নাই এখানে যে অন্য কেউ এসে বসেছেন , মেজো খালা মনে করেই তিনি যথারীতি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন চেয়ারের পিছনে।

ছোট খালা আসতে না আসতেই আবাহনীর গোল !!! চিৎকার , উল্লাস ঘরের ভিতর। আমার ছোট খালাও ছিলেন আবাহনীর সাপোর্টার , তিনিও সেই খুশীতে সামনে বসা সেই বয়স্ক লোক কে জড়িয়ে যেই ধরলেন , ধরেই দেখেন যে তার হাতে দাড়ি জাতীয় কি যেন লাগছে। আর বেচারা মুরুব্বি মানুষ আচমকা এরকম জড়িয়ে ধরে দেখে হতভম্ব হয়ে চুপ করেই ছিলেন।

মুখ ঘুরিয়ে ছোট খালা দেখেন যে মামার বন্ধুর বাবা । খুশীতে তার গলাই জড়িয়ে ধরেছিলেন মেজো খালা মনে করে ..... তারপর ভো দৌড় ভিতরে.....

চর্মগোলকের সাথে বসবাস

অদ্রোহ

তখন পড়তাম ক্লাস ওয়ানে, বয়স আর কতই বা হবে, বড়জোর ছয়। সালটা ১৯৯৪। এমনিতে আলাদাভাবে বছরটিকে মনে রাখার মত খুব একটা কারণ নেই। কিন্তু এতদিন বাদে আজ হঠাৎ সেই নাবালক বয়সের স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানোরও কারণ আছে বৈকি। তখনই যে ঠিকঠাক চিনতে শিখেছিলাম সাদা কালো চর্মগোলকটিকেআর মোটামুটি হলফ করে বলা ! যায়, ফুটবলের সাথে আমার গাঁটছড়া বাঁধার শুরুটাও ওই বছরেই। বছরটা বিশ্বকাপের। তবে বিশ্বকাপ কী বস্তু সেটা ভালমত ঠাউরে উঠতে পারিনি তখনো। শুধু ভাসাভাসা মনে পড়ে, মাঝরাতে বাবা চাচার আচমকা-গোল বলে চিৎকার করে ওঠা, পরিণামে ঘুম ঘুম চোখে আমার পিটপিট করে খানিক টিভির দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং চোখ খোলা রাখার প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও খানিক বাদেই ফের ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যাওয়া। বলা যায়, গোল শব্দটার সাথে আমার পরিচয়ও তখনই। বলতে কসুর নেই , এতসব কেচ্ছার কিছু কিছু মায়ের মুখেই শোনা।

> তবে সত্যিকারের ফুটবল ফ্যানাটিক আজকের দিনে যাদের হুলিগান নামের) গালভরা নামে ডাকা হয় ছিলেন (! আমার ছোট চাচা। তাকেই আমি প্রথম দেখেছি ব্রাজিল আর্জেন্টিনার বাইরে অন্য দলকে সমর্থন দিতে, তাও আবার যেনতেন নয়, একেবারে পাঁড় সমর্থক

ওই বছর প্রথমবারের মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপের আসর বসে। আমাদের সাথে তাদের সময়ের ব্যবধান দুস্তর , তাই খেলার সময়সূচী ছিল খানিকটা বেকায়দা গোছের , বেশিরভাগ খেলাই হত মাঝরাত্তিরে। এহেন বেমক্কা সময়ের খপ্পরে পড়েও নাকি আমার ফুটবল পাগল বাবা চাচারা নিরস্ত-হতেননা, পরের দিনের অফিসের চোখরাঙ্গানিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সেই মাঝরাতেই আমাদের আটপূরে বৈঠকখানায় একেবারে ধুন্দুমার লেগে যেত। বাবা ছিলেন ব্রাজিলের সাপোর্টার, মামা চাচারা- আর্জেন্টিনা। তবে যুদ্ধংদেহী ভাব যেটাকে বলে , তেমনটা খুব একটা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি ড্রাগ কেলেংকারীতে ম্যারাডোনার জড়ানো , এবং পরিণামে আর্জেন্টিনার চটজলদি পাততাড়ি গোটানোই হয়ত ছিল এর কারণ।

। নেদারল্যান্ডের আগাপাশতলা ভক্ত ছিলেন তিনি , ওই সময় থেকেই ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়মিত খবরাখবর রাখতেন। কোয়ার্টার ফাইনালে নাকি নেদারল্যান্ড ব্রাজিলের কাছে হেরে

যাওয়ায় ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। টোটাল ফুটবল টার্মটাও তার মুখ থেকেই প্রথম শোনা, পরে বেশ বড় হয়েও এর অর্থ জেনেছিলাম। আমার ফুটবলাসক্তির হাতেখড়িটা মূলত তার হাত ধরেই, মাঠে গিয়ে টুকটাক বলে লাথি মারতে শেখাটাও।

স্বাভাবিকভাবেই, ব্রাজিল আর্জেন্টিনার তুমুল দ্বন্দ্ব ঠাহর করার তাকত ওই- বয়সে তখনো হয়নি, তখন আমি যে দলের পোশাক মনে ধরত , তাকেই নির্বিবাদে সমর্থন দিয়ে যেতাম। তবে ওই বিশ্বকাপের একটা ঘটনার কথা আমার এখনো পষ্ট মনে পড়ে। তখন বিটিভির রাত আটটার খবর বাসায় দেখা হত , একদিন খেলার সংবাদে দেখি সাদা সবুজ- জার্সি পড়া মিশমিশে কালো এক লোক বল নিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই, মাঠের মাঝ বরাবর থেকে বল নিয়ে কীভাবে কীভাবে যেন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে বলটি জালেও জড়িয়ে দেয়। অমন খ্যাপাটে দৌড় তখন পর্যন্ত আমি আর দেখিনি এখনও এমন) দৌড় খুব একটা দেখা যায়না (, আর বলাই বাহুল্য সৌদি আরবের সাইদ আল ওয়াহরাইনের দেওয়া সেই অতিমানবীয় গোল আমার মনে রাখা প্রথম কোন গোলের স্মৃতি।

পরে বড় হয়ে যখন ৯৪ বিশ্বকাপের গোলগুলোর ক্লিপিংস দেখি , তখন আলটপকা চোখের সামনে কিছু কিছু মুহুর্তের ঝাপসা কায়া ভাসতে থাকে , আর আমিও প্রথম প্রেমের মতই প্রথম বিশ্বকাপের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি , নিজের অজান্তেই স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠি।

সেই রাতের কথা বলতে এসেছি!

নজরুল ইসলাম

ফুটবল নিয়ে অনেক স্মৃতি, বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়েও। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে একটা স্মৃতিই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ঘটনাটা আমার পরিচিত অনেকেই জানেন, তবু এটা বলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

বেশিদিন আগের কথা না, মাত্র চার বছর আগের, মানে গত বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়ের ঘটনা। সেদিন ব্রাজিলের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলা ছিলো। কার সঙ্গে এখন ভুলে গেছি।

আমি তখন উত্তরায় থাকি, একা। বিশ্বকাপ ফুটবল তো একা দেখে মজা নেই। আমরা বন্ধুরা তাই দল বেঁধে দেখতাম। একেকদিন একেক বাড়িতে। বেশিরভাগই হতো আমার অথবা সৌদের বাড়িতে। সেদিন সৌদের বাড়িতে আসর বসার কথা।

পরদিন আমার শুটিং আছে একটা। তবু রাত জেগে

> ব্রাজিল জিতছে, সেই উল্লাসে নাচি, কিন্তু এতকিছুর ভীড়েও এসএমএস বন্ধ হয় না। এসএমএস ছড়ার মারফতও ছড়িয়ে যায় সেই উল্লাস। যারা ভাবছেন প্রেম জমে গেছে, তারা ভুল ভাবছেন। তখনো আমাদের কারো মনেই কোনো প্রেম নাই। আমরা হুদাই ফাজলামিই করতেছিলাম

খেলা দেখতেই হবে। দুপুরের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিলাম। বিকেল থেকে ইন্টারনেটে এক বালিকার সঙ্গে শুরু হলো চ্যাটিং। দুজনেই ফান করছি। সে একটা দু লাইনের ছড়া লেখে, আমি দুলাইনের ছড়া লিখে রিপ্লাই দেই। সে আবার লেখে, আমিও আবার। এভাবেই চলছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। আমাদের ছড়াবাজী আর থামে না। একসময় সৌদের বাড়িতে বন্ধুরা জড়ো হলো। আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু বালিকার সঙ্গে ছড়ার খেলা তখন তুঙ্গে। ইন্টারনেট বাদ দিয়ে শুরু হলো সেল ফোনের এসএমএস, ছড়ায় ছড়ায় ছড়াছড়ি। আমরা আবার খালি মুখে খেলা দেখতে পারি না, আয়োজন থাকে ভালোই। সেদিনও ছিলো। খিচুড়ী গরুর মাংস আর বিদেশী জলবত তরলং। আমরা জলপান করি আর খেলা দেখি। ।

এই করতে করতে একসময় বালিকার সেলফোনের

ক্রেডিট শেষ হয়ে যায়। কী আর করা। এবার ক্ষান্ত দিতে হয়। ক্ষান্ত দেওয়ার আগে বালিকার অনুরোধ, খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরে একটা যেন গুডনাইট কল দেই।

বালিকা শেষ, এবার ব্রাজিল নিয়ে মাতি। ব্রাজিল যেহেতু হারে টারে না, সেদিনও যথারীতি জিতলো। আমরা উল্লাসে মাতোয়ারা। জলের ঢেউয়ে উঠলো জোয়ার। খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরলাম। এক বন্ধুও এতরাতে নিজ বাড়িতে না গিয়ে আমার বাড়িতে থাকতে এলো। সে ঘুমালে আমি বালিকাকে এবার ফোন দিলাম। জাস্ট গুডবাই বলেই রাখবো, সকালেই দৌড়াতে হবে শুটিংয়ে!

তারপর সেই রাজকন্যা

আঙুলে আঙুল জড়ালো।

আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম:

“তুমি আশা,

তুমি আমার জীবন।“

শুনে সে বলল:

“এতদিন তোমার জন্যেই

আমি হাঁ করে বসে আছি।“

আপনারা নিশ্চয়ই অনেক আগ্রহ নিয়ে

জিগ্যেস করবেন- “তারপর?”

বললাম-

“তারপর? কী বলব-

সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো”

জ্বী, সেই বালিকাই রাক্ষসের মতো খেয়ে ফেললো। কখন কীভাবে গোটা রাত কেটে গেলো জানি না। একসময় ভোর হলো, আর বালিকা এসে দরজায় কড়া নেড়ে বললো- দোর খোলো।

আমি দোর খুলে দেখি সেইজনই আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, যার জন্য আমি অপেক্ষায় আছি।

ওহহো, বলাই তো হয়নি বালিকার নাম। তার নাম নিধির মা ;)

প্রিয় দলের বিজয়, প্রিয় মানুষকে পাওয়া... সব মিলিয়ে সে এক একাকার। অনেক বিশ্বকাপ আসবে। সারাজীবনই ব্রাজিল জিতবে। অনেক উল্লাহ হবে। জলপ্রবাহ ছলকে পড়বে। কিন্তু সেই পরম প্রিয় রাতটি আর কখনো ফিরে আসবে না। এখন আমি ব্রাজিলের খেলা তাকে পাশে না বসিয়ে দেখিই না!

[কবিতাংশটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘যেতে যেতে’ কবিতার ইষৎ পরিমার্জিত রূপ]

বুচার অভ বেঙ্গল

মামুন হক

সেই হাঁটুর বয়স থেকে ফুটবল খেলি। খেলাধুলার প্রতি আমার আগ্রহ একেবারে গ্যাদাকাল থেকেই। তবে নয় বছর বয়স পর্যন্ত আমার দৌড় ছিল কানামাছি, বুড়ি চি, টিলো এক্সপ্রেস ইত্যাদি পর্যন্তই। সাড়ে নয় বছর বয়সে একদিন বাড়িওয়ালার ছেলে এবং বাল্যবন্ধু আপেল এসে ডাক দিয়ে নিয়ে গেল পাড়ার মাঠে পোলাপানের সাথে তিন নম্বর বল দিয়া খেলার নামে হুটোপুটি করতে। কয়দিন পরে এক বড়ভাই নামাইয়া দিল পাড়ার এক মিনি টুর্নামেন্টে। সেই শুরু, মজা পেয়ে গেলাম। ভালোবাসতে শুরু করলাম এই অদ্ভুত মায়া ধরানো, হাড়মাস কালা করা খেলাটিকে, সেই ভালোবাসার বাঁধন থেকে আজও মুক্তি পাইনি।

> ৮৬ সালে ম্যারাডোনার খেলা দেখে সম্মোহিত আমি এক রাতে ফুটবল খেলোয়াড় হবার ব্যাপারে মন স্থির করি। বাসায় সবাইকে পরদিনই জানাই, স্কুলের স্যারদেরকেও বলি– কিন্তু সবাই আমাকে উৎসাহ দেবার বদলে বিস্তর হাসাহাসি আর টিপ্পনী উপহার দেয়। এতে আমার আরও রোখ চেপে যায়

আসলে পেতে চাইও না। ফুটবল আমার সাথে আমার শৈশবের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর যোগসূত্র, আর তাই আজ এই বুড়ো বয়সেও ইচ্ছা করে ঝুমঝুম বৃষ্টির দিনে বল নিয়ে নেমে যেতে মাঠে, কাদামাটি মেখে, ঘাসের ঘ্রাণ শুঁকে আবারও শিশু হয়ে যেতে।

। নিজের গরজে বাসাবো মাঠে গিয়ে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবে যোগ দেই এবং একটানা বছর দুয়েক নিবিড় প্রশিক্ষনে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। ৮৭ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত কিশোর লীগ, পাইওনিয়ার লীগ, স্থানীয় অনেক ছোট-বড় টুর্নামেন্ট খেলেছি। এক পর্যায়ে মেডেল,ট্রফি, শিল্ড রাখার জন্য আমার মাকে রান্নাঘরে একটা আলাদা শেলফ বানাতে হয়। মনে আছে

ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্তঃহল খেলাগুলোতে মাঝে মাঝে হায়ারে খেলতে যেতাম। কিন্তু ইউনিতে ঢোকার আগেই বাবার অসুস্থতা এবং অর্থনৈতিক কারণে খেলাধুলা এবং অনেকটা লেখাপড়া শিকেয় উঠিয়ে টুকটাক ব্যবসা-বানিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার পেশাদার খেলোয়াড় হবার স্বপ্নের সেখানেই ইতি।

কিন্তু ফুটবলের প্রতি আমার ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রায়ই খুব অস্থির লাগতো এই ভেবে যে, যে খেলাটাকে আঁকড়ে ধরে বাড়তে চেয়েছি, সেটা কীভাবে আমার আওতার বাইরে চলে গেল। কিন্তু জীবনে শেষ কথা বলে কিছু নেই। তাইওয়ানে ঘাঁটি গাড়ার ছয়মাসের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করি যে এখানকার প্রবাসী সমাজে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয়, এবং প্রতি রবিবারে জমজমাট খেলা হয় স্থানীয় মাঠে। কিন্তু তাদের কারও সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই, জানি না দলে যোগদেয়ার নিয়ম-কানুন বা যোগ্যতার বিষয়-আশয়। একদিন সাহস করে চলে গেলাম মাঠে। বিশাল আয়োজনে একটা সিরিয়াস টুর্নামেন্ট চলছে। শহরের মেয়র থেকে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের হর্তাকর্তারা সবাই হাজির। সাংবাদিক, মিডিয়ার লোকজন চারদিকে। এর মধ্যে এক ভেতো বাঙ্গালীকে কে পাত্তা দেবে? তবুও খুঁজে নিলাম স্থানীয় দলের ম্যানেজারকে। সে ভীষণ ব্যস্ত, তবুও আমাকে বললো দলে যোগ দিতে হলে ট্রায়ালে আসতে হবে পরের সপ্তাহে। যদিও এটা একটা শৌখিন দল, তবুও খেলোয়াড় হিসাবে যোগ দিতে হলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে আসতে হবে। পড়লাম ভালোই ফাঁপরে, বলে লাথি দেই নাই প্রায় ছয়-সাত বছর হবে, বুট তো দূরের কথা, শর্টস পর্যন্ত নাই।

> মিনিট দশেকের মধ্যে সেই স্ট্রাইকারকে এমন শক্ত একটা স্লাইড ট্যাকল করলাম যে তারে স্ট্রেচারে করে মাঠ থেকে বের করতে হলো

কিন্তু এত নাই এর কথা মন মানবে কেন? রক্তে ফুটবলের নাচন শুরু হয়ে গেল। খুঁজেপেতে একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টস, রানিং স্যুজ আর হাতাকাটা গেঞ্জি পড়েই চলে গেলাম ট্রায়াল দিতে। বিশ্বাস করেন আমাকে দেখে দুই-চারজন যে মুখটিপে হাসছিলো সে কথা আমার এখনও মনে পড়ে। ট্রায়ালে এখানে আমাদের দেশের মতো দৌড়ঝাপ করায় না, আমার হুট করে নামিয়ে দিল সিক্স এ সাইড একটা প্রাকটিস খেলায়। প্রথম দশ মিনিট বলে পাই লাগাতে পারলাম না। ভেতরে ভেতরে লজ্জা আর অস্বস্তিতে ডুবে যাচ্ছি, একে তো বেমানান পোশাক-আশাক গায়ে তার উপরে কেমনে খেলে তাই ভুলে গেছি। হতাশ হয়ে যখন বেরিয়ে আসব ভাবছি, ঠিক তখনই ডি বক্সের বাইরে একটা

বল একেবারে আমার পায়ে এসে পড়লো, খোদার কসম মাথার মধ্যে ঝলকে উঠলো ছোটবেলার স্মৃতি , বল রিসিভ করেই স্বর্ণযুগের মতো মোক্ষম এক টার্নে ছিটকে ফেললাম প্রতিপক্ষের দুইজন ডিফেন্ডারকে, তারপর ডান পায়ের নিচু শটে বল ঢুকে গেল দুরূহ কোনা দিয়ে জালে। খেলা থামিয়ে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো, কোচ ডেকে নিল আমাকে আলাদা করে। জানালো যে আমার মধ্যকার আগুনটা সে ধরতে পারছে, তবে আমাকে অনেক খাটতে হবে। বিশেষ করে ফিটনেস নিয়ে।

খাটতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। নিজে থেকেই ফিটনেস নিয়ে খুব খাটলাম। কিন্তু খালি প্রাকটিসই করে যাই, মাঠে নামার কোনো চান্সই পাই না। মূল দলতো দূরের কথা রিজার্ভেও আমারে রাখে না। এক রবিবারে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এক লীগ ম্যাচে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ট্রেন মিস করে সময়মতো আসতে পারলো না। কোচ উপায় না দেখে আমাকে বললো রাইট ব্যাকে খেলতে পারব কি না। জীবনেও ডিফেন্সে খেলি নাই সব সময়েই খেলি মিডফিল্ডে, কিন্তু মাঠে নামার সুযোগ পাওয়া মাত্র লুফে নিলাম। যেখানেই নামায় খেলে দিব। কোচ আমাকে আলাদা করে বললো প্রতিপক্ষের (প্রবাসী জাপানিজ ক্লাব) এক স্ট্রাইকারকে কড়া মার্কিংয়ে রাখতে। আমার বাবা ছিলেন নামকরা ডিফেন্ডার, মনে হয় সেই ঝাঁঝটা আমার রক্তেও আছে। । সেইদিন এমন এক জোশে ছিলাম সে কথা মনে হলে এখনও অবাক লাগে। বদলী যেই প্লেয়ার নামলো তারেও আগাগোড়া মারাত্মক চাপের মধ্যে রাখছিলাম। খেলার শেষ দিকে সে নিজে থেকেই ম্যানেজারকে বললো তাকে উঠিয়ে নিতে। আমি তাকে আসলেই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম কড়া সব ট্যাকলের মাধ্যমে।

খেলাটায় আমরা ২-০ গোলে জিতলাম। আর এক খেলাতেই আমার নাম ছড়িয়ে গেল। তবে পিতৃপ্রদত্ত নাম না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার টিমের সবাই আমাকে ডাকে অন্য এক নামে, ‘ দ্য বুচার অভ বেঙ্গল।’

মামুন হক-এর ফুটবল জীবনের খণ্ডচিত্র

ফুটবলকাহন

মুক্ত বয়ান

আমরা তখন উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ি। কলেজিয়েটের মাঠ , সেখানে ঘাস ঘনহোক আর হালকা কিংবা মাঝে মাঝে , টেকো মাথার মত সবুজ এড়িয়ে সাদা বালুর উপস্থিতি কলেজিয়েটের মাঠ। এলাকার , যতই দেখা যাক ছেলেপিলেরা তো আসতোই আর সাথে অনেক দূর থেকেও ছেলেরা আসতো এই মাঠে খেলতে। কেবল এর টোই ধুন্ধুমার' ফুটবল দু- বিশালত্বের কারণে। ক্রিকেট খেলা হত সেখানে। আর সেই মাঠের অধিকারী হয়ে , পাতলা গড়নের-বিশেষ করে আমার মত দুবলা ,আমরা বা করিডোরে। ,ক্লাসরুমে , ছেলেরা খেলতাম ভেতরে আমাদের ক্লাসরুমের পাশে সিড়িঘরের মত ,যাই হোক একটা জায়গা ছিল। বেশ বড়সড় জায়গা। আমাদের ফুটবল খেলার মাঠ হত সেটাই। আমরা হইচই করে ব্যাপক উৎসাহের সাথে সেখানে খেলতাম। টিফিন পিরিয়ড শুরু হবার ঠিক আগে আগে এক জন'দু-

> আমার গুরু যেমন সারা মাঠ জুড়ে খেলতেন নাআমারও তেমনই সারা মাঠে , তার !ছোটাছুটি করতে আলসি লাগতো চাইতে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে আমার আমি ,নিকটাত্মীয় মনে হত। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ বেচারার সাথে গল্প জমিয়ে

বাথরুমে যাবার নাম করে বেড়িয়ে যেত ক্লাস থেকে। দখলদার ,কিন্তু , জায়গা দখল করতে। ঐটুকু জায়গা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ,অনেক। কাজেই !!দখলদারিত্ব

ঐ জায়গাটুকু আমার খুব প্রিয় ছিল। আমরা খেলতাম টেনিস বল দিয়ে। তখন কেবল বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। ক্রিকেট বানের জলে ভেসে গেছে। চারদিকে কেবল ফুটবল নিয়ে মাতামাতি। আর আমার প্রিয় দল , টা১৫ ব্রাজিলের রোনালদো তখন ঈশ্বরের সমতুল্য। গোল করে সে তো জাতীয় বীর। আর আমাদের তরুণদের রোলমডেল। আমিও সাথে সাথে আমার গুরু হিসেবে রোনালদোকেইঠিক করে নিই। শুরু হয় আমার ফুটবল জীবন।

গোল করেই আমি আবার ঐ গোলরক্ষককে সহমর্মিতা

জানাতে ব্যস্ত হয়ে যাই। আবারও বল আমার কাছে আসে আবারও ঐ গোলরক্ষক , বিভীষণ হয়ে যাই। ,বেচারার অবস্থা কেরোসিন করে

এর দু আমার একটা , টা বিচিত্র ফল হল। প্রথমটা হল‘ বিশাল পরিচিতি হয়ে গেল। এই ফুটবলের শর্ট ভার্সনে দলে আমার চাহিদা বেড়ে গেল। আর আমিও নিত্য , আমার চাহিদার অনস্বীকার্যতার প্রমাণ দিয়ে চললাম। কিন্তু , দ্বিতীয়টা আমার জন্যে খুব গর্বের হতে পারতো শেষে এসে লজ্জাস্কর একটা পরিস্থিতির সূচনা হল।

আমাদের স্কুলে আন্ত শ্রেণী ফুটবলের আয়োজন করা: হল। আমাদের শ্রেণী থেকেও টিম যাবে। বাছাই কিভাবে করা হবে এতগুলা ছেলে থেকে মাঠে যারা ,খুব সহজ ? টি দল করা‘ তাদের সবাইকে নিয়ে দু ,খেলতে আগ্রহী হল। সেখানে যারা খেলবে তাদের থেকে বাছাই করে নেয়া হবে। করিডোর ফুটবল তখন ব্যাপক জনপ্রিয়। সে আমার , সুবাদে আমিও একটু আধটু পরিচিত। তাই ভালো খেলতে হবে। কিস ,উপর একটা দায়িত্ব্ের কি পুরো ,এত জঘন্য খেললাম ? ৫০/৬০ মিনিট আমি বলই পেলাম না। আর বড়গুলা এত বড় বড়’ বল পেলেও , ?কেন’ এই ভাবনা ভাবতে ভাবতেই সময় চলে গেল। প্রথম বাছাইয়েই আমি দল থেকে বাদ।

স্যার ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেই মাঠে চলে এলেন হাতে খাপখোলা তরবারির মত , স্যারের এই অগ্নি ,বেত। আরমুর্তি দেখে ছেলেরা ভয় পেয়েছে খেলার সাপোর্ট করবে কি নিজেদের প্রণ বাঁচাতে সবাই ? কি ,সে কি পরিমড়ি করে দৌড়। আহা !একটা দৃশ্য

যাই হোক শ্রেণী দলে খেলার স্বপ্ন আমার তখনই মাটিচাপা। এরচেয়ে হয়ে গেলাম , দলের অফিসিয়াল সমর্থক। আমাদের খেলা নিয়ে কত কাহিনী। সেমি ফাইনালে- আমাদের সাথে খেলা ছিল দশম শ্রেণীর সাথে। সে খেলা দেখতে গিয়ে স্যারের পার্মিশন ছাড়া ক্লাস বাদ দিলাম।

এই সেমি তেই আবার বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের‘ সাথে আমরা সমর্থকদের ঝগড়া। আমাদের উদ্দশ্যে লালচোখ প্রদর্শন। আবার আমাদের এক খেলোয়াড়েরই ঐ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ধরে শান্টিং দেওয়া। পরে আমাদের কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া। কি অবস্থা!

ফুটবল নিয়ে স্মৃতিকথা বলতে বসলে আসলে সেটা শেষ হবার নয়। তাই ,আপাতত এটুকু বলে শেষ করি , আমরা সবাই বিভিন্ন দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করি। এই পক্ষপাত যেন কোন রক্তপাত না ঘটায় , সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা সবাই যেন খেলাটাকে একটা সাধারণ খেলা কোন ধরনের উচ্চরক্তচাপ জনিত ব্যাপার থেকে দূরে , হিসেবেই দেখতে শিখি। যেন বেশি বেশি খেলা দেখুন। ,থাকি। সবাই বিশ্বকাপ জ্বরে আক্রান্ত হোন। আর

সমাপ্ত
ফুটবলানন্দ
আমরা বন্ধু'র ফুটবল স্মৃতি সংকলন